মঙ্গলকাব্য

সংজ্ঞা:-

বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে সমাজের সর্বস্তরে নানা দেবদেবীর পূজা প্রবর্তনের ও তাদের লীলা মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যে যে অখ্যানধর্মী কাব্যসমূহ রচিত হয়েছিল ,সেই কাব্যগুলিকে মঙ্গলকাব্য বলে।

উদ্ভব ও সময়কাল:-

আনুমানিক খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ করে অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্রের কাল পর্যন্ত বঙ্গসহিত্যে যে বিশেষ এক শ্রেণির ধর্মবিষয়ক আখ্যান-কাব্য প্রচলিত ছিল,তাই বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মঙ্গল কাব্য নামে পরিচিত।(বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস-আশুতোষ ভট্টাচার্য)

বাংলাদেশের একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য সাধনা মঙ্গলকাব্য।মঙ্গলকাব্যগুলিতে কেবল দেবদেবীর মাহাত্ম্যই নয় ;প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত হয়েছ বাঙালীর জীবন চিত্রের খুঁটিনাটি।মঙ্গলকাব্যের প্রথম উদ্ভব পল্লীর জনসভা থেকে হলেও এটি পূর্ণ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল রাজসভায়।

কোনো বিশেষ ধর্মমত নয়; বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতি, লৌকিক-বহিরাগত ধর্মমতের মিলন,ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের সংস্কার -সংস্কৃতি,ধর্মবিশ্বাস সংমিশ্রনের ফলশ্রুতিতেই মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যের উদ্ভব।

রচনার সামাজিক প্রেক্ষাপট:-

ত্রয়োদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত মুসলমান শাসনকালেই মঙ্গল কাব্যগুলো সৃষ্টি হয়েছিল।এর পশ্চাতে কিছু সামাজিক কারণ বর্তমান ছিল।

যেমন---

- তুর্কী আক্রমণ
- উচ্চবর্ণের হিন্দুসমাজের সঙ্গে নিম্নবর্ণের লোকজীবনের মিলন
- লৌকিক দেবতাদের বাঙালী সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ
- লৌকিক দেবদেবীর সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর আর সংস্কৃতির সমন্বয়
- হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ
- বঙ্গদেশে অধিদৈবিক ও অধিভৌতিক চর্চা
- আর্য সংস্কৃতিতে ক্রমশ অনার্য দেবদেবীর প্রবেশ

'মঙ্গল' নামের উৎপত্তি:-

'মঙ্গল ' নামটি উৎপত্তির বিভিন্ন কারণ অনুমান করা হয়ে থাকে ।যেমন--

▪দেবদেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত এই কাব্যের কাহিনী শ্রবণে মঙ্গল হয় বলে মানুষের বিশ্বাস।

▪এক মঙ্গলবার থেকে আরেক মঙ্গলবার পর্যন্ত গানগুলি গাইবার রেওয়াজ ছিল।

▪প্রাচীন -মধ্য যুগের সাহিত্য মাত্রই ছিল গেয় ।তাই অনুমান করা হয় কাব্য কাহিনীর আদ্য পান্ত মঙ্গল রাগে বা প্রধানত মঙ্গল রাগেই গাওয়া হতো।

▪বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যে সকল গীত গাওয়া হতো সেগুলিকে সাধারণ ভাবে মঙ্গল বলে অভিহিত করা হয়।উত্তরাকাণ্ডে এর উল্লেখ আছে

▪ 'মঙ্গল' শব্দটি সম্ভবতঃ ভারতীয় কোনো অনার্য ভাষা থেকে আগত।দ্রাবিড় ভাষায় মিলন অথবা বিবাহ অর্থে এটি ব্যবহার

হয়।

▪ বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসকার আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন----

"প্রাচীন বাংলায় বিবাহ উপলক্ষে প্রচলিত লোকসঙ্গীতের রাগকেই মঙ্গলরাগ বলা হতো।পরে এর অর্থ সঙ্কুচিত হয়ে দেবদেবীর বিবাহ অর্থে শব্দটি ব্যবহৃত হয়।অতঃপর বাংলায় দেবদেবীর মাহাত্ম্য সূচক রচনা মাত্রই মঙ্গল নামে পরিচিত হয়েছে।"

▪মঙ্গল কাব্যের দেবদেবীর অমঙ্গলকারী শক্তি কে ভক্তের মনে স্থান না দেবার উদ্দেশ্যে মঙ্গল নামকরন হতে পারে ।

গঠন:-

মঙ্গল কাব্যের কাহিনি মূলত চারটি অংশে বর্ণিত হয়ে থাকে-

(১) বন্দনাখন্ড - এখানে বিভিন্ন দেবদেবীর বন্দনা করা হয়। শুধু তাই নয়, ধর্মবর্ণনির্বিশেষে সকল শ্রেণীর উপাস্যদের প্রতিও এখানে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। এটি মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের অসাম্প্রদায়িক চেতনা বা সর্বধর্মসমন্বয় চেষ্টার এক নিদর্শন।

(২) আত্মবিবরনী ও গ্রন্থোৎপত্তির কারণ - এই অংশে থাকে কবির আত্মপরিচয় এবং গ্রন্থ রচনার কারণ স্বপ্নাদেশ বা দৈবনির্দেশের বর্ণনা।

(৩) দেবখন্ড - এর আলোচ্য বিষয় পৌরাণিক দেবতার সঙ্গে লৌকিক দেবতার সম্বন্ধ স্থাপন। এ ক্ষেত্রে শিবের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

(৪) নরখন্ড - এ অংশের মুখ্য বিষয় পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে শাপভ্রষ্ট কোনো দেবতা বা স্বর্গবাসীর নরজীবন লাভ, নররূপে তাঁর কর্মকান্ড এবং অনেক দ্বন্দ্ব-সঙ্ঘাতের পর মানব সমাজে তাঁর পূজা প্রতিষ্ঠা। এর সঙ্গে আনুষঙ্গিক বিষয় হিসেবে থাকে নায়িকাদের বারমাস্যা, চৌতিশা, সাজ-সজ্জা, রন্ধনপ্রণালী ইত্যাদির বর্ণনা। এটিই মঙ্গলকাব্যের প্রধান অংশ।

● মঙ্গল কাব্যের সুদীর্ঘ কাহিনী কতগুলি পালায় বিভক্ত করে গাওয়া হতো।

সাধারণত আট দিনের ষোলো পালায় অর্থাৎ আট টি দিবা পালা ও আট টি রাত্রি পালায় কাহিনী বিভক্ত হতো। তবে বিষয়ানুযায়ী মঙ্গল কাব্যের পালা বিভাগ স্বতন্ত্র হতো।

ছন্দ:-

▪ মঙ্গলকাব্য প্রধানত অক্ষরবৃত্ত পয়ার ছন্দেই লিখিত।এই ছন্দকে মধ্যযুগে পাঁচলী ছন্দও বলা হতো।

▪পয়ার বা পাঁচালী ছাড়া মঙ্গলকাব্যের আরেকটি অন্যতম প্রধান ছন্দ ত্রিপদী।এই ত্রিপদী প্রধানত অক্ষরবৃত্ত ত্রিপদী।একে অনেকক্ষেত্রে লাচারী ছন্দ ও বলে।

▪ত্রিপদী ছন্দের একটি বিশেষ রূপকে ললিত ছন্দ বলে।এটিও মঙ্গলকাব্যে ব্যবহৃত হয়েছে।

▪মঙ্গল কাব্যে পয়ার ,ত্রিপদী ছাড়াও একবলী ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়।▪পয়ার ,ত্রিপদী, একবলী ছন্দ ছাড়াও মঙ্গলকাব্যের কবিগণ সংস্কৃত ছন্দের অনুকরণে ছন্দ সৃষ্টির প্রয়াস করেছেন।তোটক, তুনক প্রভৃতি ছন্দের বাংলা অনুবাদ 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্যে দেখা যায়।

লক্ষণ/বৈশিষ্ট্য:-

▪প্রথমেই মঙ্গলকাব্যে গনেশাদি পঞ্চদেবতার বন্দনা ,তারপর গ্রন্থ উৎপত্তির কারণ বর্ণন, সৃষ্টি-রহস্য,কথন প্রভৃতির সূচনা অংশে এই কাঠামো প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যে দেখা যায়।

▪দেবদেবীর মাহাত্ম্য প্রচার মঙ্গল কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য।অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিম্নশ্রেণীর চরিত্রের মহিমা প্রচারিত হতো।▪মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত কবির আত্মপরিচয় অংশে পূর্বপুরুষের পরিচয় ,বাসস্থানের বর্ণনা,স্বপ্নাদেশ প্রভৃতির অল্পবিস্তর বর্ণনা থাকে।

▪মঙ্গলকাব্যের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কবিদের ভনিতা ব্যবহার। এই অংশে কবির নাম,পদবী,আশ্রয়দাতা পৃষ্ঠপোষকের নামের উল্লেখ থাকে।

▪মঙ্গল কাব্যে বর্ণিত সমগ্র কাহিনি একাধিক পালায় বিভক্ত হয়ে থাকে।

▪মঙ্গল কাব্য দেবখন্ড ও নর খন্ডে বিভক্ত।

▪প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের নায়ক নায়িকা স্বর্গচ্যুত দেবদেবী।দেব মাহাত্ম্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই তাদের মর্ত্যে আগমন।

▪মঙ্গলকাব্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সমুদ্রপথের বর্ণনা থাকে।

▪মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য নারীদের পতিনিন্দার বর্ণনা।

▪বিপন্ন নায়ক নায়িকার দ্বারা দেবীর চৌতিশা স্তব বর্ণনা মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

▪নায়িকার বারোমাস্যার বর্ণনা মঙ্গলকাব্য তথা মধ্যযুগের কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

▪মনসামঙ্গল ছাড়া ,সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়।

▪মঙ্গল কাব্যে প্রহেলিকা ধাঁধাঁ ,প্রবাদ-প্রবচন,লোকবিশ্বাস,লোকশ্রুতি,মঙ্গলকাব্যের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

▪দেবতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহীকে দেবতার পদতলে নতশীর্ষ করানো মঙ্গলকাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

▪শঠ চরিত্রের বিপরীতধর্মী নির্বোধ চরিত্রেরাও মঙ্গলকাব্যে কোনো কোনো সময় স্থান নিয়ে থাকে,তবে এদের সংখ্যা খুব বেশি নয়।

সাধারণভাবে মঙ্গলকাব্যগুলির রচনাকাল ধরা হয় চৈতন্যপূর্ব যুগ থেকে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের সময় পর্যন্ত। ত্রয়োদশ শতকে বাংলায় মুসলিম শাসনের সমকালে কিংবা অব্যবহিত পরে এর প্রথম রূপটি তৈরি হয়। তারপর একাদিক্রমে ভারতচন্দ্র (১৭১২-১৭৬০) পর্যন্ত এ ধারা চলতে থাকে।

মনসামঙ্গল

মনসামঙ্গল মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে প্রাচীনতম। সর্পদেবী মনসার কাহিনী এর উপজীব্য। বাংলার লোকসমাজে বহু পূর্ব থেকেই সর্পপূজার প্রচলন ছিল। মনসা অনার্য দেবতা, তাই অনার্য দ্রাবিড় সভ্যতা থেকে এর আগমন ঘটেছে বলে মনে করা হয়। সর্পের বিষাক্ত ছোবল থেকে রক্ষা পাওয়ার উদ্দেশ্যেই দাক্ষিণাত্যবাসী দ্রাবিড়দের মধ্যে এই সর্পদেবীর পূজার প্রচলন হয়। বিষধর সাপ সাধারণত জঙ্গলেই থাকে, তাই সর্পদেবীর বিষহরী, জাঙ্গুলী, পদ্মাবতী ইত্যাদি নামও দেখা যায়।

মনসামঙ্গলের প্রচলিত কাহিনীটি হচ্ছে বণিক চন্দ্রধর বা চাঁদ সওদাগরের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্ব এবং শেষপর্যন্ত চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার পূজা প্রদানের মধ্য দিয়ে তার সমাপ্তি। চন্দ্রধর ছিলেন শিবভক্ত। মনসা চাইলেন চাঁদের মাধ্যমে লোকসমাজে তার পূজা প্রচার করতে। কিন্তু পূজা দেওয়া থাক দূরের কথা, চাঁদ তাকে দেবী বলেই স্বীকার করেন না। এতে চাঁদ এবং তাঁর পরিবারের ওপর নেমে আসে মনসার চরম অত্যাচার। ক্রোধবশত মনসা চাঁদের সপ্তডিঙ্গা সমুদ্রে ডুবিয়ে দেন এবং তাঁর সাত ছেলেকে সর্পদংশনে মেরে ফেলেন। অবশেষে কনিষ্ঠপুত্র লখিন্দরের সদ্য পরিণীতা স্ত্রী বেহুলার পতিভক্তি, চারিত্রিক দৃঢ়তা, অসীম মনোবল এবং কঠোর সাধনার কাছে দৈবশক্তি পরাভব মানে এবং চাঁদের সপ্তডিঙ্গাসহ সাত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করে বেহুলা শ্বশুর বাড়ি ফিরে যায়।

মনসামঙ্গলের এই কাহিনী মূলত নিগৃহীত মানবতার জীবনকথা। মানবিকতার সর্বময় পরাভব ও গ্লানিকর সেই যুগে চন্দ্রধর ও বেহুলা দুটি আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ও প্রতিবাদী চরিত্র। উচ্চ-নীচ ভেদ, আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব ইত্যাদি তৎকালীন সমাজের বিষয়গুলি মনসা-চাঁদ-বেহুলার ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। দেবতা ও মানুষের দ্বন্দ্বে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্য এবং চাঁদের সঙ্গে মনসার বিবাদে আর্য-অনার্য দ্বন্দ্ব প্রকাশ পেয়েছে। কারণ চাঁদ ছিলেন শিবের ভক্ত। শিব অনার্যসম্ভূত হলেও আর্যদেবতাদের শ্রেণীভুক্ত। পরিণামে অবশ্য এই বিভেদ আর থাকেনি। বেহুলার ব্যক্তিত্বের কাছে দেবতাদের পরাজয় এবং চন্দ্রধর কর্তৃক মনসার পূজা দেওয়ায় সব বিভেদ দূর হয়ে যায়। এসব ঘটনা থেকে আরও একটি বিষয় পরিস্ফুট হয় যে, মানুষ প্রকৃতপক্ষে দৈবশক্তির ওপর নির্ভরশীল নয়, বরং দৈবই মানুষের ওপর নির্ভরশীল; দৈব ছাড়া মানুষের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মানুষ ছাড়া দৈবের কোন অস্তিত্ব নেই। তাই পূজা প্রচারের জন্য অন্যান্য দেবতার মতো মনসাকেও একজন মানুষ অর্থাৎ চন্দ্রধরের ওপর নির্ভর করতে হয়েছে। বেহুলা চরিত্র থেকে ভারতীয় নারী, বিশেষত বাঙালি নারীর পতিভক্তির স্বরূপ

উন্মোচিত হয়েছে।

মনসামঙ্গলের আদি কবি কানা হরিদত্ত, কিন্তু তাঁর গ্রন্থ পাওয়া যায়নি। তিনি ১৩শ শতকে জীবিত ছিলেন বলে অনুমান করা হয়। এরপর আর যাঁরা মনসামঙ্গল রচনা করেন তাঁরা হলেন পুরুষোত্তম, নারায়ণদেব (আনু. ১৫শ শতক), বিজয়গুপ্ত এবং বিপ্রদাস পিপিলাই বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গলই (১৪৯৪) সর্বাপেক্ষা পরিচিত এবং সাহিত্যিক গুণসম্পন্ন। বিপ্রদাসের গ্রন্থ মনসাবিজয় পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রচিত বলে গবেষকদের অনুমান।

চন্ডীমঙ্গল

চন্ডীমঙ্গল মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। চন্ডীদেবীর কাহিনী এর উপজীব্য। এই চন্ডীদেবীও মূলত অনার্যসম্ভূতা, পরে বৌদ্ধ ও হিন্দু তন্ত্রের দেবকল্পনার প্রভাবে পর্যায়ক্রমে পৌরাণিক দেবতায় পরিণত হন। এর বিষয়বস্তু দুটি সামাজিক কাহিনীকে কেন্দ্র করে নির্মিত হয়েছে। প্রথমটি কালকেতু-ফুল্লরার জীবনকথা এবং দ্বিতীয়টি ধনপতি-লহনা-খুল্লনার কাহিনী। কালকেতু একজন দরিদ্র ব্যাধ। দেবী চন্ডীর কৃপায় দারিদ্র্যপীড়িত জীবন থেকে কালকেতু-ফুল্লরা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়। কিন্তু ধনগর্বে গর্বিত কালকেতু-ফুল্লরা দেবীকে বিস্মৃত হলে আবার তারা অশেষ দুর্গতিতে পড়ে। অবশেষে দেবীর শরণাপন্ন হয়ে তারা পুনরায় ধন-সম্পদ ও সুখ-সমৃদ্ধি লাভ করে।

দ্বিতীয় কাহিনী অনেকটা মনসামঙ্গলের মতো। ধনপতি একজন ধনবান ও বিলাসী সওদাগর। তিনি শ্যালিকা খুল্লনার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর লহনার তত্ত্বাবধানে খুল্লনাকে রেখে তিনি যান বাণিজ্যে এবং সেখানে বারবনিতায় আসক্ত হয়ে পড়েন। এই সুযোগে দাসীর প্ররোচনায় লহনা খুল্লনার ওপর চালায় অকথ্য নির্যাতন। একদিন বনে ছাগল চরাতে গিয়ে খুল্লনা বিপদে পড়ে চন্ডীর মাহাত্ম্য জানতে পারে। তারপর চন্ডীর কৃপায় সে বিদেশ প্রত্যাগত স্বামীর সোহাগ-ভাগিনী হয়। আরেক দিন গর্ভবতী খুল্লনাকে বাড়িতে রেখে ধনপতি পুনরায় বাণিজ্যে যান। ধনপতি ছিলেন শৈব, তাই চন্ডীবিদ্বেষ হেতু সেখানে তিনি কারারুদ্ধ হন। এদিকে খুল্লনার এক পুত্রসন্তান জন্মে। তার নাম রাখা হয় শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হয়ে চন্ডীর কৃপায় পিতাকে বিপদ থেকে উদ্ধার করে। এরপর ধনপতি চন্ডীমাহাত্ম্য স্বীকার করেন।

স্পষ্টই বোঝা যায় যে, চন্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার ও পূজাপ্রচলনের উদ্দেশ্যেই উপর্যুক্ত কাহিনী দুটি সাজানো হয়েছে। তবে এর মধ্য দিয়ে তখনকার সমাজের অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। সপত্নীবিদ্বেষ, পুরুষের ভোগলালসা ও রূপাসক্তি, নগর প্রতিষ্ঠা, ব্যাধসমাজের রীতি-নীতি ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান, কালকেতুপীড়িত বন্য পশুদের চন্ডীর নিকট কাতর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে নির্যাতিত মানুষের দুঃখদুর্দশার রূপায়ণ ইত্যাদি বিষয় কাব্যে চিত্রিত হয়েছে। চন্ডীমঙ্গলের চরিত্রগুলি মানবীয় গুণাগুণসম্পন্ন এবং সমাজরসে পরিপুষ্ট। তাই সমালোচকদের দৃষ্টিতে চরিত্রকল্পনায় চন্ডীমঙ্গল শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত।

চন্ডীমঙ্গলের আদি কবি মাণিক দত্ত। তিনি মালদহের লোক ছিলেন বলে মনে করা হয় এবং তিনি ছিলেন চৈতন্যপূর্বযুগের কবি। তাঁর কাব্যের একটি অনুলিপির কাল ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ। চন্ডীমঙ্গলের দুজন শ্রেষ্ঠ কবি হলেন দ্বিজ মাধব ও মুকুন্দরাম। দুজনই ষোলো শতকের কবি এবং এঁদের হাতেই চন্ডীমঙ্গল মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দুজনের কাব্যই বৈষ্ণব ভাবাদর্শ দ্বারা প্রভাবিত। দ্বিজ মাধবের কাব্যের রচনাকাল ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দ। এতে চন্ডীমঙ্গলের কাহিনী সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করেছে এবং বৈষ্ণব পদাবলির অনুসরণে ছোট ছোট গীতিকবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে।

মুকুন্দরাম সমগ্র মঙ্গলকাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবি হিসেবে বিবেচিত। তাঁর কাব্যে ব্যক্তিজীবনের ঘটনাপঞ্জি একটি সার্বজনীন রূপ লাভ করেছে। মানব জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, লাঞ্ছনা-উপভোগ ইত্যাদি বিপরীতধর্মী বৃত্তিগুলির অপূর্ব মিশ্রণে তিনি বিরল সমন্বয়শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এর ফলে চরিত্রগুলিতে যে জীবনমুখিতার সৃষ্টি হয়েছে তা সর্বকালের মানবপ্রীতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

চন্ডীমঙ্গল ধারায় আরেকখানা গ্রন্থ আছে দ্বিজ রামদেবের অভয়ামঙ্গল। গ্রন্থটি চট্টগ্রাম অঞ্চলে রচিত এবং এতে ঐ অঞ্চলের ভাষার প্রভাব আছে। এতে 'ফেরাঙ্গি' শব্দের উল্লেখ থাকায় পোর্তুগিজ আগমনের পরে সতেরো শতকের মাঝামাঝি এটি রচিত হয়েছে বলে মনে করা হয়। কাব্যে দ্বিজ মাধবের প্রভাব আছে।

অন্নদামঙ্গল

চন্ডীর বহু নামের মধ্যে একটি হলো 'অন্নদা'। মধ্যযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্র এ নামেই তাঁর বিখ্যাত কাব্য অন্নদামঙ্গল রচনা করেছেন। অবশ্য এটিকে কেউ কেউ মঙ্গলকাব্য বলতে চান না। এর কারণ মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে এর

পার্থক্য নানা দিক থেকে। যেমন, চন্ডীমঙ্গলের চন্ডীর যে চন্ডমূর্তি, অন্নদামঙ্গলে তা দেখা যায় না। এখানে তিনি অভয়া, বরদা ও অন্নপূর্ণারূপে যেন একজন স্নেহময়ী বঙ্গজননী। অন্যান্য চন্ডীমঙ্গলে পূজা পাওয়ার জন্য চন্ডীর যে কোপনা স্বভাব, এখানে তা নেই; এখানে তিনি দাক্ষিণ্যময়ী। হয়তো উদ্ভবের পর থেকে তিনশ বছর ধরে হিন্দুসমাজে চন্ডীর প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হয়েছে, তাই তাঁর মধ্যে উগ্রতা পোষণের আর প্রয়োজনীয়তা ছিল না। এ ঘটনার মধ্য দিয়ে আরেকটি বিষয়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, নতুন করে কেউ কোথাও প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাইলে সেখানে তাকে শক্তিপ্রয়োগ করতে হয় এবং প্রতিষ্ঠালাভ সম্পন্ন হলে অধীনস্থদের সর্ব প্রকারে প্রতিপালন করতে হয়। এমনিভাবে আরও অনেক মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

ভারতচন্দ্র ছিলেন আঠারো শতকের শ্রেষ্ঠ কবি এবং তাঁর অন্নদামঙ্গল এ সময়ের শ্রেষ্ঠ কাব্য। কাব্যটি তিন খন্ডে তিনটি স্বতন্ত্র কাহিনীতে পূর্ণতা লাভ করেছে। প্রথম খন্ডে শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, দ্বিতীয় খন্ডে বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল এবং তৃতীয় খন্ডে মানসিংহ-অন্নপূর্ণামঙ্গল কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। প্রথম উপাখ্যানের মূল ঘটনা পৌরাণিক। এতে সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীর বিবাহ, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীর অন্নপূর্ণামূর্তি ধারণের বর্ণনা আছে। সেসঙ্গে যুক্ত হয়েছে হরিহোড়কে ছেড়ে দেবী কিভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দের পিতৃগৃহে উপস্থিত হন সেই লৌকিক কাহিনী। দ্বিতীয়টি বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী। কালিকার কৃপায় কিভাবে সুন্দর বিদ্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন এবং মশান থেকে অব্যাহতি পেয়েছিলেন সে কাহিনী বর্ণিত হয়েছে এখানে। তৃতীয় অংশটি অনেকটা ঐতিহাসিক। মানসিংহ কর্তৃক প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দিকরণ এবং সম্রাট জাহাঙ্গীরের নিকট থেকে ভবানন্দের 'রাজা-ই-ফরমান' লাভের ঘটনা এখানে বর্ণিত হয়েছে।

অন্নদামঙ্গল থেকে তৎকালীন বাঙালি সমাজের অনেক তথ্যই পাওয়া যায়। দেবী ও ঈশ্বরী পাটনীর ঘটনা থেকে দেব-মানুষের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যায়। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে' দেবীর নিকট পাটনীর এই বর প্রার্থনার মধ্য দিয়ে অনুমান করা যায় যে, তখন ন্যূনপক্ষে দুধভাত খাওয়ার নিশ্চয়তা ছিল বাঙালি জীবন-যাত্রার নিম্নতম স্ট্যান্ডার্ড। অন্নদামঙ্গলে আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এতে দৈবপ্রাধান্য কম, সে স্থান দখল করেছে মানুষ। এখানে দেবীর সন্তুষ্টিকামনা অপেক্ষা রাজার সন্তুষ্টিকামনা তীব্রতর। মূলত নদীয়ার রাজবংশের গৌরবময় ইতিহাস বর্ণনা করতে গিয়ে কবি সমকালীন ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে দৈব ঘটনা মিশিয়ে নগরসংস্কৃতিসুলভ একটি আদিরসাত্মক প্রণয়োপাখ্যান রচনা করেছেন। এর সাহিত্যিক মূল্যও অসাধারণ। উপমাদি অলঙ্কার এবং ছন্দপ্রয়োগে তিনি যে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন তাতে তাঁর মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে।

ধর্মমঙ্গল

ধর্মমঙ্গল ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যসূচক কাব্যধারা। ধর্ম অনার্য দেবতা এবং সূর্য কিংবা বুদ্ধের প্রতিরূপ হিসেবে কল্পিত। প্রাচীন বঙ্গের রাঢ় অঞ্চলে এঁর উদ্ভব ও পূজা সীমিত ছিল। ধর্মপূজা দীর্ঘকাল অন্ত্যজ শ্রেণীর মধ্যে প্রচলিত থাকায় সতেরো শতকের পূর্ব পর্যন্ত এতে কোন আর্যপ্রভাব পড়েনি এবং কোন আর্যপুরাণে ধর্মের কথা পাওয়াও যায় না। সতেরো শতকের পরে যুগপরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে ধীরে ধীরে পৌরাণিক ধর্মাদর্শের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে ধর্মঠাকুর পৌরাণিক দেবতার পর্যায়ভুক্ত হন।

ধর্মমঙ্গলের প্রচলিত কাহিনী লাউসেনের সংগ্রামী জীবনের কথা। রামপালের পুত্র যখন গৌড়ের রাজা তখন তাঁর শ্যালক মহামদ পাল ছিলেন রাজমন্ত্রী। মহামদের ভগ্নী রঞ্জাবতীর সঙ্গে বৃদ্ধ সামন্তরাজ কর্ণসেনের বিবাহ হয়। এদের পুত্রই লাউসেন। লাউসেনের সঙ্গে মহামদ ও ইছাই ঘোষের বিভিন্ন সময়ে দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বে ধর্মের কৃপায় লাউসেনের বিজয়, ধর্মের সঙ্গে বিবাদের ফলে মহামদের কুষ্ঠব্যাধি, লাউসেনের অনুরোধে ধর্ম কর্তৃক ব্যাধির নিরাময় এবং সবশেষে ধর্মপূজার মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি ঘটে।

ধর্মমঙ্গলের আদি কবি ময়ূর ভট্ট। তাঁর কাল খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতক বা এর কাছাকাছি অনুমান করা হয়, কিন্তু তাঁর কাব্যের নিদর্শন পাওয়া যায়নি। তাঁর পরের কবি রূপরামের কাল ষোলো শতক এবং মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাল সতেরো শতকের মধ্যভাগ ধরা হয়। ধর্মমঙ্গলের অপর একজন কবি সীতারাম দাসের কাব্য রচনার কাল ১৬০৮ খ্রিস্টাব্দ মনে করা হয়। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্তী। তাঁর কাব্যের রচনাকাল ১৭১১ খ্রিস্টাব্দ। কাব্যটি বীররসপ্রধান। এরপর আর যাঁরা ধর্মমঙ্গল রচনা করেছেন তাঁরা হলেন সহদেব (১৭৩৫), নরসিংহ (১৭৩৭), হৃদয়রাম (১৭৪৯), গোবিন্দরাম (১৭৬৬?) প্রমুখ।

ধর্মমঙ্গলে রাঢ়ের জনজীবনের যে চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তা অভিনব এবং তাতে বাঙালির জাতীয় মানসের এক নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো এতে বাঙালি চরিত্র মেরুদন্ডহীন ও দৈবনির্ভররূপে চিত্রিত হয়নি, বরং রাজনৈতিক সঙ্ঘাত ও দেশরক্ষার উদ্দেশ্যে দৃঢ়সংকল্প এবং অনমনীয় প্রতিশোধপরায়ণরূপে চরিত্রগুলি নির্মিত হয়েছে। মনসামঙ্গল ও চন্ডীমঙ্গলে কাহিনীর মূলকেন্দ্রে রয়েছে দেবতা, মানুষ সেখানে অনুষঙ্গ মাত্র; কিন্তু ধর্মমঙ্গলের মূল কাহিনী আবর্তিত হয়েছে মানুষকে কেন্দ্র করেই। এখানে আছে সামাজিক সঙ্ঘাত ও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব, দৈবঘটনার প্রাধান্য এখানে

কম; বরং দৈবঘটনাকেই এখানে আনুষঙ্গিক বলা যায়। তৎকালীন রাঢ়ের রাজনৈতিক জীবনযাত্রা এবং সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষের গৌরবময় দেশাত্মবোধ ধর্মমঙ্গলকে অন্যান্য মঙ্গলকাব্য থেকে পৃথক করেছে এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও একে এক বিশেষ মর্যাদায় ভূষিত করেছে।

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল মৌলিক কোন ধারার মঙ্গলকাব্য নয়। মঙ্গলকাব্য রচনার যে উদ্দেশ্য কোন দেবতার পূজা প্রচার এ ক্ষেত্রে তাও লক্ষণীয় নয়। তবে শিব চরিত্রটি প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যের মধ্যেই একটি অপরিহার্য যোগসূত্ররূপে উপস্থিত। হয়তো বাঙালির জীবনযাত্রার প্রতীকরূপেই শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য জীবন, তাঁদের দারিদ্র্যপীড়িত দাম্পত্য জীবনের মান-অভিমান ইত্যাদি সমস্ত মঙ্গলকাব্যের দেবখন্ডে মূল আখ্যানের ভূমিকারূপে চিত্রিত হয়েছে। এতে অবশ্য মঙ্গলকাব্যের জনপ্রিয়তাই বেড়েছে এবং এ অনুপ্রেরণা থেকেই শিবের নামে প্রচলিত সমস্ত লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী সংগ্রহ করে একটি কোষগ্রন্থ প্রণীত হয়, যা পরবর্তীকালে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নামে পরিচিতি লাভ করে। তাই এতে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যের মতো শিবের পূজা প্রচারের কোন প্রচেষ্টা লক্ষিত হয় না। অবশ্য তার আবশ্যকতাও নেই, কারণ শিব অন্যতম প্রাচীন দেবতা এবং সমাজে তিনি সুপ্রাচীনকাল থেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। হয়তো এমনও হতে পারে যে, মনসা, চন্ডী ইত্যাদি নতুন দেবদেবীর আগমনে যাতে আদিদেবতা হারিয়ে না যান, তাঁর মর্যাদা যাতে অটুট থাকে সে উদ্দেশ্যেই শিবায়নের সৃষ্টি।

শিবায়ন ধারার প্রথম কবি রামকৃষ্ণ রায় সতেরো শতকের প্রথম পাদে তাঁর কাব্য রচনা করেন। এতে প্রধানত পৌরাণিক শিবের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। শিবের সংসারের অভাব-অনটন এবং তা নিয়ে শিব-পার্বতীর মনোমালিন্য এখানে গতানুগতিকভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে ছন্দোবৈচিত্র্য, ভাষার সংযম এবং কিছু সাহিত্যিক গদের প্রয়োগ একে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে। আঠারো শতকের প্রথম দিকে রচিত রামেশ্বর ভট্টাচার্যের শিবায়নই সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়। এতে শিবের লৌকিক চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে। শিবকে এখানে কৃষিকার্যরত, গার্হস্থ্যকর্মে উদাসীন এবং ভোজনরসিকরূপে দেখানো হয়েছে। এর ফলে কৃষকপ্রধান বাঙালি সমাজে শিব যেন একেবারে ঘরের মানুষ হয়ে উঠেছেন; তাঁর রূপকে যেন বাঙালি চরিত্রই মূর্ত হয়ে উঠেছে। শিবের কৃষিচর্চার মধ্য দিয়ে তৎকালীন কৃষকজীবনের নানা সমস্যার কথাও জানা যায়।

অন্যান্য মঙ্গলকাব্য

এগুলি ছাড়া বিভিন্ন বিষয় অবলম্বনে আরও অনেক মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। যেমন, চৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে ষোলো শতকে রচিত জয়ানন্দ ও লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল, আঠারো শতকে বিভিন্ন দেবদেবীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত সূর্যমঙ্গল, গঙ্গামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল, সরস্বতীমঙ্গল, রায়মঙ্গল, কালিকামঙ্গল, সারদামঙ্গল, গৌরীমঙ্গল, দুর্গামঙ্গল ইত্যাদি। এগুলিতে সমসাময়িক সমাজের রীতিনীতি, সংস্কার, ধর্মীয় বিশ্বাস, জীবন-জীবিকা ইত্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে।

তথ্যসূত্র : বাংলাপিডিয়া ও ইন্টারনেট